Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

An In Depth Study of a Song of Tagore : "O Keno Churi Kore Chay"

"ও কেন চুরি করে চায়" : রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অন্তরঙ্গ পাঠ

Nag Goutam Kumar
Dept of Foreign Languages ,University of Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The aim of the present paper is to analyze the salient linguistic features of a well known song of Tagore : o keno churi kore chay. It should be noted that this study is confined only to the poetic aspect of the song ; the musical aspect is excluded. The theme addressed here is the transformation of a girl into a woman with the awakening of love --- a theme that Tagore has developed in some of his short stories. In this song the transition into womanhood and the evolution in the feelings of the poet are suggested implicitly. Our objective is to reconstruct this story by reading between the lines and carrying out an in depth study of the constituent elements of the song at various levels : lexical, morpho-syntactic and semantic.

Key words : love, transformation, girl, woman, linguistic features

Article

এই নিবন্ধটি একটি পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ। এই গানের সাঙ্গীতিক রূপটি আমাদের আলোচ্য নয়, এর কাব্যরূপের সৌন্দর্য আস্বাদন করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা নির্বাচন করেছি প্রেম পর্যায়ের **৩৯১** নং গানটি। আমাদের আলোচ্য প্রেমের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি কেমন করে প্রতিফলিত হয়েছে এই গানের কাব্য অবয়বনির্মাণের বিভিন্ন স্তরে : শব্দচয়নে, শব্দসমূহের পারস্পরিক অন্বয়ে, বিভিন্ন ব্যকরণগত উপাদান অলঙ্কারের ব্যবহারে। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যসমূহের এই পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সেইসঙ্গে ভাষায় নয়, আভাসে ব্যক্ত না বলা বাণীর ব্যঞ্জনাটুকুও অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

ও কেন চুরি ক'রে চায়।
নুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়।
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা--
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়॥
কী যেন গানের মতো বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চ'লে মালাটি গেছে ফেলে--০
পরানের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়॥ [১]

এই গানে প্রযুক্ত বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের প্রাথমিক পর্যালোচনাতে একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে --- রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে যা নিতান্ত বিরল। এই গানটি সম্পূর্ণ বিশেষণবিহীন। সর্বনাম ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উত্তম ও মধ্যমপুরুষ এই গানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রেম পর্যায়ের তিনশ পঁচানব্বইটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে বিশেষণবিহীন, উত্তম ও মধ্যমপুরুষবর্জিত গান মাত্র দুটি ; আমাদের আলোচ্য গানটি ছাড়া অন্য গানটি হল ৩৭৮ নং গানটি : "নিমেষের তরে শরমে বাধিল"। এই দুটি গান বাদ দিলে এই পর্যায়ের আরও নটি গানে প্রথমপুরুষের এমন একাধিপত্য দেখা যায়। কিন্তু ওই গানগুলির প্রত্যেকটিতে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

গানের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার কাব্য অবয়বের বিভিন্ন অংশের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ আছে। এক্ষেত্রে যতিচিহ্নের ব্যবহার লক্ষণীয়। ডবল দাঁড়ি ব্যবহার হয়েছে দুবার --- চতুর্থ কলির শেষে এবং অষ্টম বা শেষ কলির শেষে। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে আটকলিবিশিষ্ট গানটিকে সমদৈর্ঘ্যের দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়। আমরা এই নিবন্ধে প্রথম চারটি কলি অর্থাৎ স্থায়ী ও অন্তরা অংশকে গানের প্রথম পর্ব ও পরবর্তী চারটি কলিকে অর্থাৎ সঞ্চারী ও আভোগ অংশকে গানের দ্বিতীয় পর্ব বলে চিহ্নিত করব। আমরা দেখব এই বিভাজনের সঙ্গে গানের ভাববস্তুর উপস্থাপনার একটা নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রথমে আমরা এই দুই অংশের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করব। এই আলোচনারও ভিত্তি হবে সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের ব্যবহার।

গানের প্রথম পর্বে তিনটি কলিতে ক্রিয়ার কর্তা একই সর্বনাম --- প্রথমপুরুষের একবচন। প্রথম কলিতে 'ও' চতুর্থ কলিতে তার প্রতিরূপ 'সে'। দ্বিতীয় কলিতে কর্তা উহ্য থাকলেও সহজেই অনুমান করা যায় এই অনুক্ত কর্তা হল সেই 'ও' বা 'সে'। কেবলমাত্র তৃতীয় কলিতে ক্রিয়ার অনুক্ত কর্তা 'ফুলেরা' অর্থাৎ তৃতীয় কলি বাদ দিলে সর্বত্রই 'ও' অথবা 'সে'র দৃশ্যমান বা অদৃশ্য উপস্থিতি। পক্ষান্তরে গানের দ্বিতীয় পর্বে শুধুমাত্র তৃতীয় কলিতেই 'ও' অথবা 'সে' ক্রিয়ার কর্তা --- অবশ্য এই বাক্যে কর্তা উহ্য। চিত্রাকারে বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপন করা যায় :

কলিসংখ্যা	বাক্যের কর্তার ভূমিকায় ও / সে	
	প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব
১	+	–
২	+	–
৩	–	+
৪	+	–

চিত্র - ১

দেখা যাচ্ছে গানের দুটি পর্বেই তৃতীয় কলিটি বাকি অংশ থেকে স্বতন্ত্র।

ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে এই দুই পর্বের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় দুটি পর্যায়ে : সংখ্যায় এবং কালরূপে। প্রথম পর্বে প্রতিটি কলিতে একটি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে অর্থাৎ এই অংশে সমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা চার। এছাড়াও প্রতিটি কলিতেই অন্তত একটি অসমাপিকা ক্রিয়া অথবা ক্রিয়াপদগুচ্ছ আছে। দ্বিতীয় পর্বে প্রথম তিনটি কলির প্রত্যেকটিতে একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং শেষ কলিটি ক্রিয়াপদবর্জিত অর্থাৎ এই অংশে সমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা তিন। কিন্তু এই অংশে কেবলমাত্র তৃতীয় কলি ছাড়া অন্য তিনটি কলিতে অসমাপিকা ক্রিয়া নেই। অর্থাৎ গানের প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বে ক্রিয়ার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এরপর গানের দুই পর্বে প্রযুক্ত সমাপিকা ক্রিয়াপদসমূহের কালরূপের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রথম পর্বে শুধুই সাধারণ বর্তমান এবং দ্বিতীয় পর্বে শুধুই পুরাঘটিত বর্তমান। আমরা গানের মর্মবস্তুর আলোকে ক্রিয়ার এই সংখ্যার হ্রাস এবং কালরূপের প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করব।

বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে গানের কাব্য অবয়বের পূর্বোক্ত বিভাজনের সঙ্গে তার ভাববস্তুর উপস্থাপনার সম্বন্ধটি দেখা যাক। আমরা দেখব এই গানটি স্বল্পপরিসরে এক অপরূপ রূপান্তরের আখ্যান --- প্রেমের মায়ামন্ত্রে এক বালিকার পূর্ণ নারীতে রূপান্তরের আখ্যান। এমন রূপান্তরের কাহিনি বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "সমাপ্তি" ও "মাল্যদান" ছোটগল্পে। বলা বাহুল্য ভাববস্তু সমতুল হলেও কাব্যে ও ছোটগল্পে উপস্থাপনকৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন । সেই তুলনামূলক আলোচনায় আমরা আসব নিবন্ধের শেষে। আপাতত আমাদের বক্তব্য প্রেমের উন্মেষের পূববর্তী ও পরবর্তী দুটি অধ্যায় গ্রথিত হয়েছে এই গানের দুটি পর্বে। গানের প্রথম পর্বে জুড়ে অপরিণত বালিকার লঘু হাস্যময় প্রাণচাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় পর্বে আভাসিত প্রেমের মোহিনীমায়ায় প্রস্ফুটিত তার পূর্ণ নারীসত্তা। প্রাথমিক পাঠে সম্পূর্ণভাবে এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয় না, বিশেষত এই বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশের। কিন্তু আমরা দেখব গানের গভীরতর পাঠের মাধ্যমে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

গানের প্রথম পর্বের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ কলি অর্থাৎ এই অংশের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে বালিকা --- যাকে প্রথমপুরুষ সর্বনামের (ও/সে) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। গঠনগতভাবে স্বতন্ত্র তৃতীয় কলিতে নির্মিত হয়েছে নৈসর্গিক পটভূমি --- পুষ্পশোভিত বনভূমি। প্রথমে আমরা প্রথমোক্ত তিনটি কলির আলোচনা করব।

গানের শুরুতেই সেই বালিকার উপস্থিতি --- গানের প্রথম কথাই 'ও'। এই 'ও'কে ঘিরে প্রেমিক কবির আত্মগত আবেগ অনুভূতির কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটে না, কবি অন্তরালে থেকে যান। তাঁর এই উপস্থাপনকৌশল সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশেষণ ও উত্তমপুরুষের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে। কবির অনুভূতির আলোকে নয় , সেই নামপরিচয়হীনাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে। 'ও'কে বিশেষিত করতে কোন বিশেষণ না থাকলেও তার কার্যকলাপ নির্দেশক প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়াকে বিশেষিত করতে অন্তত একটি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বা পদগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। 'চায়', 'পালায়' এবং 'যায়' সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলিকে বিশেষিত করছে যথাক্রমে 'চুরি করে', 'হেসে' এবং 'চকিতে চমকিয়ে'। বলা যায় বিশেষ্যের বিশেষণের অভাব পূরণ করছে ক্রিয়াবিশেষণধর্মী অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। গানের এই অংশে দৃশ্যপট জুড়ে থাকে শুধু ক্রিয়া --- action অর্থে। এই 'ও'র স্বরূপ উপলব্ধি করতে গানের এই অংশে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদসমূহের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথম দুটি কলিতে প্রযুক্ত ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে একটা ঐক্য দৃষ্টিগোচর হয় --- সর্বত্র গোপনতার প্রচেষ্টা। প্রথমে গোপন দৃষ্টিপাত (চুরি করে চায়), তারপর হাস্য গোপনের প্রচেষ্টা (নুকোতে গিয়ে হাসি) এবং অবশেষে

আত্মগোপনের প্রয়াস (পালায়)। গোপনতাদ্যোতক পদসমূহের অবস্থানে একটা ত্রিভূজাকৃতি জ্যামিতিক নকশা ফুটে ওঠে।

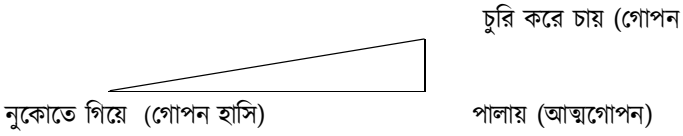

চিত্র – ২

গোপনতার এই প্রয়াসের ধারাবাহিকতা চতুর্থ কলিতেও অব্যাহত থাকে। সমাপিকা ক্রিয়া 'যায়' কেবল স্থানান্তরগমন নির্দেশ করে না, ' চকিতে ... চমকিয়ে' এবং 'কোথা দিয়ে' পদগুচ্ছযোগে এই 'যাওয়া' 'পালানো'র সমার্থক হয়ে ওঠে। দেখা যাচ্ছে এই তিনটি কলির তিনটি সমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে দুটিই গতিদ্যোতক : 'পালায়', 'যায়'। তার ফলে বালিকাকে নিয়ে নির্মিত দৃশ্যকল্পগুলির মধ্যে গতিময়তা সঞ্চারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কলি সম্বন্ধে আরও কিছু সংযোজন করা যেতে পারে। কলির অভ্যন্তরে, শুরুতে ও শেষে গোপনতাদ্যোতক পদগুচ্ছের মাঝখানে "হাসি' ও 'হেসে" র অবস্থানে যেন প্রবল হাস্য গোপনের প্রাণপণ প্রয়াস মূর্ত হয়ে ওঠে। সমধাতুজ এই দুই বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সহাবস্থানে অবরুদ্ধ সেই হাস্যলহরী যেন শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

এই গানের 'ও' বা 'সে'র আচরণের মধ্য দিয়ে তার যে রূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে সে রূপ এক অপরিণত বালিকার। গোপনতার প্রাণপণ প্রয়াস, অস্থিরতা, অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাস --- সবই উচ্ছল শিশুমনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। গানের এই পর্বে নির্মিত হয়েছে শৈশবের পরিমন্ডল তবে তারই সঙ্গে আভাসিত পরিণতমনস্কের জগৎ। এই দুই জগতের দূরত্ব অভিব্যক্ত প্রশ্নবোধক শব্দের ব্যবহারে। প্রশ্নবোধক শব্দ গানের প্রায় শুরুতেই ('কেন') এবং এই অংশের শেষ কলিতে ('কোথা দিয়ে')। কবি অন্তরালে থাকলেও এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তাঁর পরোক্ষ, অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করা যায়, তাঁর অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়। এই অনুভূতি শুধুই কৌতূহলের --- শিশুকে ঘিরে, তার কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে পরিণত মনে যে কৌতূহলের সঞ্চার হয়।

প্রাণচঞ্চলা বালিকার ক্রিয়াকলাপের পটভূমিতে পুষ্পবিভূষিত বনভূমি --- মৃদু পবনে আন্দোলিত পুষ্পরাজি। গানের এই পর্বের বৃহত্তর অংশ জুড়ে চিত্রিত এই বালিকার জগৎ আর বাকি অংশে নির্মিত নিসর্গলোকের পটভূমি --- এই দুইয়ের মধ্যে একটা সমান্তরলতা ধরা পড়ে। অরণ্যপ্রকৃতির পুষ্পশোভায় মানুষের হাতের, মানুষের ভাবনার কোন স্পর্শ নেই --- আদিম প্রকৃতি আপন সৌন্দর্যলীলায় নিমগ্ন। একইভাবে আপনার সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিতে,প্রাণশক্তিতে চালিত সেই বালিকা --- পরিণত মানবসংসারের বিধিনিয়মে তার আচরণ, তার চিন্তা নিয়ন্ত্রিত নয়। ফুলদলের খেলা যেন সেই বালিকার খেলারই প্রতিচ্ছবি।

ফুলের সঙ্গে বালিকার সম্বন্ধের নিবিড়তার একটি রূপ প্রতিবিম্বিত বাক্যগঠনের স্তরে। আমরা উল্লেখ করেছি তৃতীয় কলিতে 'খেলা করা' ক্রিয়াপদের অনুক্ত কর্তা 'ফুলেরা'। কিন্তু এই কলিটির পাঠান্তর সম্ভব। দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে ওই অনুক্ত কর্তা 'ফুলেরা' নয়, অন্য তিন কলির মত এক্ষেত্রেও কর্তা 'ও' বা 'সে'।

বনপথে ফুলের মেলা (ও /সে) হেলেদুলে করে খেলা

এই পাঠ অনুসারে এই কলির প্রথমার্ধে রচিত হয়েছে নৈসর্গিক পটভূমি, দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রায়িত বালিকার খেলা। দেখা যাচ্ছে একই শুন্যস্থান পূরণ করতে পারে 'ফুল' অথবা 'ও' --- এর মধ্যে ফুলদল এবং বালিকার একাত্মতার ইঙ্গিত নিহিত আছে। শুধু তাই নয় অন্যান্য বাক্যের মত এই বাক্যের কর্তাও যদি এই বালিকাই হয় তাহলেও এই অংশে একটা আচরণগত পার্থক্য ধরা পড়ে। নিজের জগৎ থেকে যখন সে পরিণতমনস্কের জগতের সীমানায় এসে দাঁড়ায় তখন সে শুধু অন্তরাল থেকে সকৌতুকে পর্যবেক্ষণ করে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে দ্রুত পলায়ন করে। দুই জগতের ব্যবধান অনতিক্রম্য। কিন্তু শিশুর জগৎ আর নিসর্গজগৎ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। তাইতো যখন সে অরণ্যপ্রকৃতির মাঝে তখন তার মধ্যে কোনরকম দূরত্ব সৃষ্টির বা আত্মগোপনের সামান্যতম প্রয়াস দেখা যায় না, সেখানে সে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। ক্রীড়ামগ্ন বালিকার নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ মনোভাবের প্রকাশ এই কলিতে ক্রিয়াবিশেষণধর্মী অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুচ্ছ "হেলেদুলে"র প্রয়োগে। অপরিশীলিতা এই বালিকা বনপ্রকৃতির অঙ্গীভূতা --- সে নিজেই যেন বনপথের ধারে বিকশিত একটি ফুল।

অপরিণত বালিকার সঙ্গে নিসর্গজগতের এই একাত্মতা আমরা রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোট গল্পে দেখি। বনপ্রকৃতির পটভূমিতে এই বালিকার হাস্যোচ্ছ্বাস, প্রাণচাঞ্চল্য "সমাপ্তি"র মৃন্ময়ীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মৃন্ময়ীর মত ততখানি দুরন্তপনা, অপরের দুর্দশা উপভোগের সেই মানসিকতা আমরা এই স্বল্পপরিসরে এই বালিকার মধ্যে দেখতে না পেলেও, বনপ্রকৃতির পটভূমিতে তার হাস্যোচ্ছ্বাস, প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে মৃন্ময়ীর ছায়া দেখা যায়। অরণ্যপ্রকৃতি না হলেও পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে মৃন্ময়ীর একাত্মতা ওই আখ্যানের একাধিক স্থানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।একটি উদাহরণ :

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল (...) ।[২]

"মাল্যদান" ছোটগল্পেও অপরিণত বালিকার সঙ্গে অরণ্যপ্রকৃতির অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। কুড়ানির সঙ্গে যতীনের প্রথম সাক্ষতের মুহূর্তে সেই বালিকা সম্বন্ধে হরকুমারের মন্তব্য :

" (...) উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিণী।"[৩]

এই গল্পে পরবর্তী কালেও একাধিকবার কুড়ানিকে বনের হরিণী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রথম পর্বের অবসানের পর পরবর্তী পর্বে যখন যবনিকা উত্তোলিত হয়, তখন অপরিণত বালিকা এক পূর্ণ নারীতে রূপান্তরিতা। আমাদের এই বক্তব্যের ভিত্তি বর্তমান মুহূর্তে তার পরিবর্তিত আচরণ নয়। গানের দ্বিতীয় পর্বে তার কোন কার্যকলাপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধুমাত্র তৃতীয় কলিতে যেখানে বাক্যের কর্তা 'ও' বা 'সে' সেখানেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়েছে অতীতে। প্রথম পর্বের শেষে তার বিদায়ের পর আর তার প্রত্যাবর্তন ঘটে নি। সুতরাং তার অতীত ও বর্তমান ক্রিয়াকলাপের তুলনামূলক আলোচনার কোন সুযোগ নেই। আমাদের এই বক্তব্যের ভিত্তি তাকে ঘিরে কবির হৃদয়ে সঞ্চারিত অনুভূতির বিবর্তন। এখানে গানের দুই পর্বের একটি বৈপরীত্য ধরা

পড়ে। প্রথম পর্বে ওই বালিকার রূপ প্রতীয়মান হয় তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে, কবির দৃষ্টির আলোকে নয়। বিপরীতভাবে দ্বিতীয় পর্বে ওই রূপান্তরিতা নারীর রূপটি প্রতিভাত কেবল কবির অনুভূতির আলোকে, তার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে নয় কেননা তখন সে দৃষ্টির অন্তরালে । এই পর্বে কবিহৃদয়ে উদ্রিক্ত অনুভূতি প্রথম পর্বের মত কৌতূহলের নয়। সেই অনুভূতি অনেক গভীর --- যা অপরিণত শিশুকে ঘিরে জাগতে পারে না --- যার প্রাণকেন্দ্রে থাকে কোন পূর্ণ নারী। গানের দুই পর্বের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের যে বৈপরীত্য আমরা ইতিপূর্বে নির্দেশ করেছি তারই গভীরতর পাঠের মাধ্যমে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করব।

আমরা গানের দুই পর্বে সর্বনাম কর্তার (ও/সে) প্রয়োগের ভিত্তিতে তৃতীয় ভিন্ন অন্য তিনটি কলির মধ্যে একটি ঐক্য নির্দেশ করেছি। দ্বিতীয় পর্বে এই ঐক্য উক্ত সর্বনাম কর্তার অনুপস্থিতিতে --- আপাতদৃষ্টিতে এক্ষেত্রে কোন সদর্থক যোগসূত্র নেই। কিন্তু গভীরতর পাঠে তেমন একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এই ঐক্য কবির ভূমিকায়। ব্যকরণগত গঠনের বিচারে এই পর্বেও কবি অনুপস্থিত ; প্রথম পর্বের মত গানের দ্বিতীয় পর্বও উত্তমপুরুষবর্জিত। কিন্ত তৎসত্ত্বেও এই অংশে কবির উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। প্রথম দুটি কলিতে ধ্বনিদ্যোতক ক্রিয়া “বাজা” এবং শ্রুতিদ্যোতক ক্রিয়া “শোনা যাওয়া” কোনটিরই কর্তা কবি নন; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শ্রোতা কবি। প্রথম কলিতে উহ্য উত্তমপুরুষের সম্বন্ধপদের রূপ “‘আমার” --- বিশেষ্য “কানের” সঙ্গে সম্পৃক্ত (আমার কানের কাছে)। দ্বিতীয় কলিতে বাক্যটি কর্মবাচ্যে। কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করলে বাক্যের কর্তা হবে “আমি” --- আমি তার প্রাণের কথা আধেকখানি শুনেছি। শেষ কলিতে প্রথম কলির মতই উহ্য আছে উত্তমপুরুষের একবচনের সম্বন্ধপদের রূপ “আমার”: বিশেষ্য “পরাণের” সঙ্গে যুক্ত (আমার পরাণের আশাগুলি)। গানের দুই পর্বে বালিকা ও কবির ভূমিকার মধ্যে একটা সমান্তরলতা ধরা পড়ে। প্রথম পর্বে তৃতীয় ভিন্ন অন্য সব কলিতে বালিকার ভূমিকা প্রধান, অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্বের ওই কলিগুলিতে কবির ভূমিকা প্রধান ; যদিও সবক্ষেত্রেই বালিকা ক্রিয়ার কর্তা, তার উপস্থিতি দৃশ্যপটের বৃহত্তর অংশ জুড়ে কিন্তু কোনক্ষেত্রেই কবি ক্রিয়ার কর্তা নন এবং তার উপস্থিতি কেবল অনুভব করা যায়। একই সমান্তরলতা দেখা যায় অবশিষ্ট তৃতীয় কলিতেও : প্রথম পর্বে এই কলিতে বালিকার কোন ভূমিকা নেই , এইস্থানে আছে শুধু নৈসর্গিক পটভূমি। দ্বিতীয় পর্বে ওই একই কলিতে কবির কোন ভূমিকা নেই , তাঁর অনুভূতির কোন বহিঃপ্রকাশ নেই, এইস্থানে আছে শুধুই একটি দৃশ্যকল্প। চিত্রাকারে বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

কলিসংখ্যা	পর্ব			
	প্রথম		দ্বিতীয়	
	কলির বর্ণনীয় বিষয়	বালিকার ভমিকা	কলির বর্ণনীয় বিষয়	কবির ভমিকা
১	গোপন দৃষ্টিপাত	+	কানের কাছে এক অচেনা ধ্বনির গুঞ্জরণ	+
২	সহাস্য পলায়ন	+	রূপান্তরিতা নারীর প্রাণের কথা শুনতে পাওয়া	+
৩	বনপথে ফলের খেলা		পথে মালা ফেলে যাওয়া	
৪	দ্রুত স্থানান্তরগমন	+	ফেলে যাওয়া মালাটিকে নূতন দৃষ্টিতে দেখা	+

চিত্র – ৩

প্রথম পর্বের বর্ণনা বহিরঙ্গসর্বস্ব। আমরা প্রত্যক্ষ করি ওই বালিকার কার্যকলাপের বাহ্য রূপটি। সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ক্রিয়ার (action) উপর। তাই আমরা দেখেছিলাম এই পর্বে প্রতিটি কলিতে একটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে এবং প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়াকে বিশেষিত করতে অন্তত একটি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে সব ক্রিয়াকে ছাপিয়ে কবির অন্তরের অনুভূতিই প্রধান হয়ে ওঠে। এটি এই পর্বে ক্রিয়াপদের সংখ্যা হ্রাসের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। আমরা দেখেছি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়াই যথাক্রমে সাধারণ বর্তমানে ও পুরাঘটিত বর্তমানে। এই সাধারণ বর্তমান কোন চিরন্তন সত্য বা নিয়মিত অনুষ্ঠিত ঘটনা নির্দেশ করছে না, নির্দেশ করছে বিবৃতিমুহূর্তে অনুষ্ঠিত অসমাপ্ত একক ঘটনা। এই সাধারণ বর্তমান ঘটমান বর্তমানেরই প্রতিরূপ --- যে প্রয়োগের অজস্র দৃষ্টান্ত আমরা সাহিত্যে, বিশেষত কাব্যে পাই। অর্থাৎ ওই বালিকার ক্রিয়াকলাপ শ্রোতা বা পাঠক একটির পর একটি প্রত্যক্ষ করে। দ্বিতীয় পর্বে আর কোন ঘটনা ঘটে না, বর্তমান মুহূর্তে শুধু থাকে অতীতে সম্পন্ন ঘটনার স্মৃতি। শেষ কলিতে একটি ক্রিয়াবিহীন বাক্য --- ঘটনাপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রথম পর্বে প্রযুক্ত ক্রিয়াগুলির কালরূপের কারণে এবং অধিকাংশের আর্থ বৈশিষ্ট্যের কারণে চিত্রকল্পগুলি গতিময় হয়ে উঠেছে ; অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্বের রূপকল্পগুলি প্রায় নিশ্চল। সব মিলিয়ে বলা চলে প্রথম পর্বে আমরা দেখি এক বালিকার উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্য আর দ্বিতীয় পর্বে প্রেমিক কবির গভীর ভাবনিমগ্নতা।

ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের পর এবার আমরা এই দুই পর্বের রূপকল্পগুলির তুলনামূলক আলোচনা করব। প্রথম পর্বে প্রতিটি রূপকল্পই দৃষ্টিগ্রাহ্য। এই অংশে ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎ সম্পূর্ণভাবেই দৃষ্টির জগৎ। অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্বের ইন্দ্রিয়চেতনাজগৎ আরও প্রসারিত, আরও বৈচিত্র্যময়। প্রথম কলিতে একটি শ্রুতিগ্রাহ্য রূপকল্প --- কানের কাছে বেজে ওঠা অচেনা এক ধ্বনি। তারপর তৃতীয় কলিতে আবার একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্প --- পথে পড়ে থাকা একটি মালা। দ্বিতীয়ত প্রথম পর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়চেতনার স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে প্রতিভাত চিত্রকল্প ভাবনায় নূতনতর রূপকল্প রচনা করে না। অন্তরালে থেকে বহিরঙ্গ ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার যে কৌশল কবি প্রথম পর্বে অবলম্বন করেছেন তারই প্রকাশ ওই অংশে উপমা, রূপক বা সবরকম সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের অনুপস্থিতিতে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় পর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রই ইন্দ্রিয়চেতনাজগতের সীমানা অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীতে উত্তরণের একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কানের কাছে বেজে ওঠা ধ্বনি কবিপ্রাণের গভীরে নূতনতর এক ধ্বনির মত গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। পথের ধারে অবলুণ্ঠিত পুষ্পমালা কবির মানসনেত্রে "পরাণের আশায় গাঁথা" মালারূপে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দুবারই কবি তাঁর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে উপমানের আশ্রয় নিয়েছন, দুবার উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ ঘটেছে। অর্থালঙ্কারের প্রয়োগের ফলে এই পর্বে কবির অদৃশ্য উপস্থিতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্বের গঠনকৌশলটি সুস্পষ্ট। প্রথমে ইন্দ্রিয়চেতনায় বিধৃত বাস্তবের বিবরণ, পরবর্তী কলিতে সেই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট বিভ্রমের বাণীরূপ। আরও সহজভাবে বলা যায়, প্রথম কলিতে উপমেয়, পরবর্তী কলিতে উপমান। এইভাবে সমান্তরালতা দেখা যায় প্রথম ও তৃতীয় কলির মধ্যে, তারপর দ্বিতীয় ও চতুর্থ কলির মধ্যে।

রূপকল্পের প্রকতি	ইন্দ্রিয়চেতনায় উন্মোচিত রপকল্প	কলিসংখ্যা	বিভ্রম	কলিসংখ্যা
ধ্বনি	কানের কাছে বেজে ওঠা গীতময় এক ধ্বনি	১	তার প্রাণের কথা শুনতে পাওয়া	২
দৃশ্য	পথের ধারে পড়ে থাকা একটি মালা	৩	মালাটি পরাণের আশায় গাঁথা বলে মনে হওয়া	৪

চিত্র – ৪

আমরা দেখেছি দ্বিতীয় পর্বের প্রথমে উপস্থাপিত রূপকল্পটি সমগ্র গানের অন্যান্য রূপকল্পের থেকে স্বতন্ত্র। এই পর্বের অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকল্পটি এবং প্রথম পর্বের রূপকল্পগুলির সবগুলিই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্প, শুধু আমাদের আলোচ্য রূপকল্পটিই শ্রুতিগ্রাহ্য । কিন্তু স্বাতন্ত্র্য কেবল এখানেই নয়। উক্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পগুলি সবই ইন্দ্রিয়চেতনায় প্রতীয়মান সত্য। এই বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য ওই শ্রুতিগ্রাহ্য রূপকল্পটি সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে একথা বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে এই পর্বের প্রথম কলির ক্রিয়া "বেজেছে"র কর্তা এবং অধিকরণকারকরূপে প্রযুক্ত পদগুচ্ছ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে ধ্বনি বেজে ওঠে তা সম্পূর্ণ পরিচিত নয়, তাকে ঘিরে কেমন যেন রহস্যময়তা। এই ক্রিয়ার কর্তা ধ্বনিদ্যোতক কোন একক পদ নয়, একটি পদগুচ্ছ : কী যেন গানের মত। প্রশ্নবোধক শব্দ (কী), বিভ্রমদ্যোতক শব্দ (যেন), , এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ (মত) --- এমন সমন্বয় সেই ধ্বনির স্বরূপনির্ণয়ের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার বা অন্ততপক্ষে আংশিক ব্যর্থতার সঙ্কেতবাহী। তারপর এই ধ্বনি "কানে" বাজে না, বাজে "কানের কাছে"। এখানে প্রশ্ন জাগে এই ধ্বনি কি শ্রুতিরিন্দ্রিয়ে বেজে ওঠা কোন ধ্বনি, নাকি "প্রাণের শ্রবণে" শ্রুত ধ্বনি? অন্যভাবে বললে প্রশ্ন জাগে ধ্বনির উৎস নিয়ে : এই উৎস বহির্জগৎ না অন্তর্জগৎ ? দুটি সম্ভাবনার কোনটিকেই অস্বীকার করা যায় না। এই ধ্বনিশ্রবণ যেমন সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা হতে পারে আবার এমনও হতে পারে যে এই ধ্বনির কোন বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব নেই। প্রেমের উন্মেষে প্রাণের গভীর গহনে সঞ্চারিত অনাস্বাদিতপূর্ব, অনির্বচনীয় অনুভূতিকে ব্যক্ত করতেই কবি হয়ত চেনা অচেনায় মেশা এক ধ্বনির রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। এই রূপকল্পের অবস্থান কোথায় --- ইন্দ্রিয়চেতনাবলয়ের অভ্যন্তরে না ইন্দ্রিয়চেতনার সীমানা ছাড়িয়ে --- সেই সংশয়ের নিরসন হয় না। সংশ্লিষ্ট কলির উল্লিখিত শব্দসমন্বয় এক আলো-আঁধারির আবহ সৃষ্টির অনুকূল। পক্ষান্তরে ঘটনাপ্রধান পূর্ববর্তী পর্বের রূপকল্পগুলিকে ঘিরে কোথাও কোনরকম অস্পষ্টতা নেই। কোন আলো ছায়ার খেলা নেই, প্রতিটি রূপকল্পই দিবালোকের মত সমুজ্জ্বলরূপে জাগ্রত ইন্দ্রিয়চেতনায় উদ্ভাসিত। প্রথম পর্বের পর দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় গানের অভিমুখ পরিবর্তনের যে রূপ ধরা পড়ে তার দুটি পাঠ সম্ভব। প্রথম সম্ভাবনা --- ইন্দ্রিয়চেতনার এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তরণ ঘটছে । দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যাত্রা ইন্দ্রিয়চেতনালোক থেকে অতীন্দ্রিয়চেতনালোকে।

প্রথম পর্বের রূপকল্পগুলি সম্বন্ধে যা বলা হল এই পর্বের তৃতীয় কলিতে উপস্থাপিত রূপকল্প সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে এই পর্বে এই কলিটির সাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা যা বলেছি তার সঙ্গে একটি সংযোজন করা যেতে পারে। এই পর্বে কেবল এই রূপকল্পটিই সন্দেহাতীতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের অন্তর্গত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ কলিতে চিত্রিত হয়েছে শুধুই মনের বিভ্রম। এছাড়া আমরা দেখলাম প্রথম কলিতে

ব্যবহৃত রূপকল্পটির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা সম্বন্ধে সংশয় রয়ে যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চেতনাজগৎ নিশ্চিতভাবে এই পর্বের শুধু এক তৃতীয়াংশ অধিকার করে থাকে। দুই পর্বের বৈপরীত্যটি চিত্রাকারে তুলে ধরা যায় :

	বর্ণিত রূপকল্পের ইন্দ্রিয়চেতনাগ্রাহ্য বাস্তব অস্তিত্ব	
কলিসংখ্যা	প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব
১	+	?
২	+	-
৩	+	+
৪	+	-

চিত্র - ৫

প্রেমের উন্মেষের পূর্বে সত্য শুধু ইন্দ্রিয়চেতনা, পরবর্তী পর্বে তাকে অতিক্রম করে যায় প্রাণের গভীর গহন থেকে উৎসারিত অনুভূতি।

তৃতীয় কলির চিত্রকল্পটি নিয়ে আরও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। পথের ধারে পড়ে থাকা মালার দৃশ্যকল্পটি প্রেম পর্যায়ের আর একটি গানকে মনে করিয়ে দেয়।

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে।।
.....
তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে---
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে ।।[৪]

অনুরূপ একটি চিত্রকল্প প্রেম পর্যায়ের আর একটি গানে পাওয়া যায়। শুধু পথের পরিবর্তে এই মালা তৃণতলে পড়ে থাকে।

ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী,
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে।।
.....
প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিনু মালা,
ছিল পড়ে তৃণতলে অশোকবনে।[৫]

রবীন্দ্রভাবনায় মালা বহুক্ষেত্রে প্রেমের পরম দানের বা পরম প্রাপ্তির প্রতীক। এই গানে প্রেমাস্পদার প্রতি প্রেমিক কবির প্রার্থনা কেবল একটি মালা :

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা
তব নব প্রভাতের নবীন-শিশির-ঢালা ।।[৬]

দূরদেশী রাখাল ছেলে তার গানের বিনিময়ে মুগ্ধ শ্রোত্রীর কাছে একই প্রার্থনা করে। এই গানের পর্যায় বিচিত্র হলেও এই গানে অভিব্যক্ত অনুভূতিকে প্রেমের অনুভূতি ভাবা যেতে পারে।

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে।।
.....
আমি তারে শুধাই যবে 'কী তোমারে দিব আনি' ---
সে শুধু কয়, 'আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।' [৭]

এই কলির বিশ্লেষণ আমরা সমাপ্ত করব পূর্ববর্তী পর্বের ওই একই কলির সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে।

বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
.....
পথেতে যেতে চ'লে মালাটি গেছে ফেলে—

প্রথমে দেখা যাচ্ছে বনপথের স্থানে আসে পথ। অপরিশীলিতা, বনহরিণীর মত চঞ্চলা বালিকার ক্রিয়াকলাপের পটভূমিরূপে বনপ্রকৃতির পটভূমি নির্মাণের ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। বালিকার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই বনের পটভূমিও অদৃশ্য হয়ে যায়। পুষ্পসুশোভিত বনপথ হয়ে ওঠে শুধু তার পায়ে চলার পথ। এই কলির সব সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'ও' বা 'সে'।

প্রথম পর্বে যেখানে ছিল বনফুলের খেলা, দ্বিতীয় পর্বে সেখানে দৃশ্যপট জুড়ে থাকে তার ফেলে যাওয়া ফুলমালা। এই দৃশ্যান্তরের তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য। প্রথম পর্বের ফুল আর দ্বিতীয় পর্বের মালার মধ্যে রয়েছে অন্তর্বর্তী একটি অধ্যায় --- যা পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। এই অন্তর্বর্তী পর্ব সৃজনপ্রক্রিয়ার, নিমগ্ন সাধনার। আমরা দেখেছি প্রথম পর্বে প্রাণচঞ্চলা বালিকার খেলা আর মন্দ পবনে আন্দোলিত ফুলের খেলা একই সূত্রে বাধা পড়ে আছে। তারপর প্রথম প্রেমের প্রকাশ লঘু চঞ্চল অসংস্কৃত চিত্তে নান্দনিক চেতনার স্ফূরণে। অস্থিরচিত্ত বালিকা এবার স্থির একাগ্রচিত্তে মালা গাঁথে। বনপথের ধারে ফুটে থাকা ফুল --- আদিম প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা সৌন্দর্যের উপকরণ থেকে সযত্ন প্রয়াসের মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় --- গাঁথা মালা।

প্রেমের পূর্ণতার প্রতীকরূপে মালার রূপকল্পের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে বজ্রসেনের গানে :

হৃদয়বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল
সেই প্রেম এই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল, রূপ নিল।
এই ফুলহারে, প্রেয়সী, তোমারে বরণ করি---
অক্ষয়মধুর সুধাময় হোক মিলনবিভাবরী।
প্রেয়সী, তোমায় প্রাণবেদিকায় প্রেমের পূজায় বরণ করি। [৮]

বণিক বজ্রসেন সুবর্ণদ্বীপ থেকে যে ইন্দ্রমণির হার নিয়ে এসেছিল, যে রত্নহার রাজপ্রাসাদে উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব সে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা সে নগরকোটালের লুব্ধদৃষ্টি থেকে রক্ষা করে চলেছিল বিনামূল্যে যাকে দেওয়া যায় তার কণ্ঠে দেওয়ার জন্য --- সেই বহুমূল্য রত্নহার কিন্তু সে শ্যামাকে পরায় না। যে ইন্দ্রমণির হারের কথা দিয়ে এই নৃত্যনাট্যের সূচনা হয়েছিল পরে আর তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফুলহারেই তার প্রেয়সীকে বরণ করে বজ্রসেন প্রেমের পূজা সম্পন্ন করে। এই পুষ্পমাল্যরচনা প্রেমের সাধনারই প্রতীকী রূপ। আমাদের আলোচ্য গানেও বনফুলে গাঁথা মালা উন্মেষিত প্রেমের মাধুরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহী রূপ।

শুধু প্রেমের গানেই নয়, পূজা পর্যায়ের গানেও আমরা এই প্রতীকের ব্যবহার দেখি। অনেক গানেই দেখা যায় পূজার নৈবেদ্য বাহ্য কোন উপকরণ নয়, অন্তরের অনুভূতি ; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, অসম্বদ্ধ আবেগে পূজা সম্পন্ন হতে পারে না। নিমগ্নচিত্তের সাধনায় তা যখন পূজার উপাচারে পরিণত হয় তখন শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত সেই ভাবানুভূতির চিত্রায়ণে গাঁথা মালা বা মালা গাঁথার প্রতীক ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল যে, পার হল।
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে, সকল সুখের সার হল।।
এত দিন নয়নধারা বয়েছে বাঁধনহারা,
কেন বয় পাই নি যে তার কূলকিনারা---
আজ গাঁথল কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হল ।। [৯]

যে সাধনায় দুঃখ সকল সুখের সার হয়ে ওঠে, অবিরল অশ্রুধারাবর্ষণে সেই সাধনা সফল হয় না। সেই সাধনা সাঙ্গ হয় যখন সেই অশ্রু মালার রূপ পরিগ্রহ করে। অনুরূপ একটি উদাহরণ :

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার। [১০]

এই গানে অবশ্য স্পষ্টভাবে অশ্রুমালার কথা বলা হয় নি, কিন্তু উল্লিখিত মুক্তাহারকে অশ্রুমালা বলে ভাবা কোনভাবেই অযৌক্তিক হবে না। পুর্বোল্লিখিত গানটির মত এই গানেও শুধু চোখের জলে পূজা সম্পন্ন হয় না, তাকে সোনার থালায় "সাজিয়ে" দিতে হয়।

কখনও কবি নিজে সেই মালা গাঁথেন, কখনও আবার তিনি তাঁর আরাধ্যের উদ্দেশে প্রার্থনা জানান বহু বাসনায় ধাবমান তাঁর চঞ্চল হৃদয়কে ভক্তিবন্ধনে গ্রথিত করে মালার রূপ দিতে :

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে---
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর---
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার , ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।। [১১]

পরবর্তী গানটিতেও কবির প্রার্থনা তার উদভ্রান্ত হৃদয়কে সংহত করতে। যিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া মনকে ফিরিয়ে আনেন, সেই আরাধ্যের উদ্দেশে তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁর ব্যর্থ আশার পুনরুজ্জীবনের, সেই আশাকে গাঁথা মালার রূপ দেওয়ার :

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না হারা ।।
.....
হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার ।।
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার করে সারা।। [১২]

উপমেয়ের পর সবশেষে উপমানের বিশ্লেষণ করে আমরা এই পর্বের আলোচনা সমাপ্ত করব। উপমানযুগলের মধ্যে ঐক্য সুস্পষ্ট --- দুইয়েরই কেন্দ্রবিন্দু "প্রাণ"। এই গানের পর্বান্তরকে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাতে এইভাবে ব্যক্ত করা যায় :

থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোক-না এখন প্রাণের মেলা--- [১৩]

আমাদের আলোচ্য গানের প্রথম পর্ব ছিল সেই "কেবল খেলা"র পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে "প্রাণের মেলা"র সূচনা হল। তাই এই পর্বে আমরা দুবার বিশেষ্য "প্রাণ"এর প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। (দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত "পরাণ" যেহেতু "প্রাণ"এরই কোমল রূপ, তাই আমরা এই প্রয়োগকে একই বিশেষ্যের পুনরাবৃত্তি বলে ধরে নিচ্ছি)। এই গানে বিশেষ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই।

পরপর দুবারই ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎ থেকে অবতরণ ঘটেছে প্রাণের গভীর অতলে। লক্ষণীয় প্রথম পর্বের সমান্তরাল ওই দুটি কলিতেই ছিল গতিদ্যোতক ক্রিয়া "পালায়" ও "যায়'। প্রথম পর্বে যেখানে ছিল তীব্র গতিময়তা, দ্বিতীয় পর্বে সমান্তরালভাবে সেখানেই আসে মুগ্ধ প্রাণের স্পর্শ।

"প্রাণের কথা" এবং "পরাণের আশা" --- এই পদগুচ্ছযুগল এই গানে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যায় এই দুটি হল key words। প্রেমের উন্মেষ এবং বালিকার রূপান্তরের যে তত্ত্ব আমরা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি তার ভিত্তি মূলত উল্লিখিত পদগুচ্ছযুগল। এই গানের কোথাও "প্রেম" শব্দটি বা তার কোন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয় নি। সমগ্র গানটিতে নিশ্চিতভাবে প্রেমের অনুষঙ্গবাহী হল উক্ত পদগুচ্ছযুগল। প্রথম পর্বের লঘু চপলতা, উচ্ছলতার পর এই পর্বে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে না পেলেও আমরা এক অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করি --- এমন একজনের যার বাহ্য ক্রিয়াকলাপ দৃষ্টিগোচর হয় না, প্রথম অনুভব করা যায় তার প্রাণের স্পর্শ। যে প্রাণের কথা প্রথম প্রয়াসে সবটুকু শোনা যায় না, শুধু "আধেকখানি"ই শোনা যায়, যে কথা কী এক অজানা গানের সুরে বেজে ওঠে। যে মনের রূপ গানের এই স্থানে আভাসিত হয়, সেই মন শিশুর মন নয়, সেই মন এক রমণীর মন --- যে মন সহস্র বর্ষের সাধনার ধন। একইভাবে যাকে ঘিরে " পরাণের আশাগুলি" গাঁথা হয় সে কোন অপরিণত বালিকা হতে পারে না। তার ফেলে যাওয়া মালাকে ঘিরে সঞ্চারিত আশা সংশয়াতীতভাবে প্রেমেরই অভিব্যক্তি।

উল্লিখিত পদগুচ্ছের সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্বন্ধপদগুলি পর্যালোচনাযোগ্য। "প্রাণের কথা"র সঙ্গে যুক্ত প্রথমপুরুষের একবচনের সম্বন্ধপদের রূপটি : তার। "প্রাণের কথা" কার এই বিষয়ে কোনরকম দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ নেই। অপরদিকে "পরাণের আশাগুলি"র সঙ্গে কোন সম্বন্ধপদ ব্যবহৃত হয় নি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কোন সম্বন্ধপদ উহ্য রয়েছে। আমরা বলেছিলাম এই উহ্য সম্বন্ধপদ উত্তমপুরুষের : আমার। অর্থাৎ পথের ধারে মালাটি দেখে আশার সঞ্চার হয়েছে কবির প্রাণে। কিন্তু এই কলির ভিন্নতর পাঠ সম্ভব । উহ্য সম্বন্ধপদটি প্রথমপুরুষেরও হতে পারে : তার পরাণের আশাগুলি। গভীর আশা নিয়ে উদ্ভিন্নযৌবনা সেই নারী পথের ধারে ওই মালা রেখে গেছে। দুটি ব্যাখ্যাই সমান গ্রহণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে প্রথম কলির উহ্য সম্বন্ধপদটিও পর্যালোচনাযোগ্য। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি "কানের কাছে"র সঙ্গে যুক্ত অনুক্ত সম্বন্ধপদ হচ্ছে "আমার"। "আমার কানের কাছে" এবং "তার প্রাণের কথা" --- প্রেমের বিকাশের প্রথম স্তরে "আমি" ও "সে" দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরে এসে "আমি" ও "সে"র মধ্যবর্তী বিভাজনরেখা অবলুপ্ত হয়ে যায়। "আমার পরাণের আশা" ও "তার পরাণের আশা" মালার মতই

একই সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। অনুভবের গভীরতায় অনুভবকারীর অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়, সত্য হয়ে থাকে শুধু অনুভব --- পরাণের আশা।

আমরা উল্লেখ করেছি এই গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুটি ছোটগল্পের ভাববস্তুগত ঐক্য রয়েছে --- প্রেমের উন্মেষে বালিকার মধ্যে পূর্ণ নারী সত্তার জাগরণ। "সমাপ্তি" অথবা "মাল্যদান" ছোটগল্পে যা বিবৃত হয়েছে ঘটনার বিবরণে, প্রেমের উন্মেষের বিভিন্ন স্তরের চিত্রায়ণে, আমাদের আলোচ্য গানে তাই ব্যক্ত হয়েছে --- সুস্পষ্ট ভাষায় নয়-- আভাসে,সঙ্কেতে। আমরা প্রেমের স্ফুরণের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বালিকার সেই উচ্ছল রপটি গানে দেখেছি যেমন ঘটেছে ছোটগল্পে। কিন্তু তার পূর্ণ নারীরূপটি গানে কোথাও প্রত্যক্ষ করি নি। তার পরিবর্তে আমরা দেখেছি কবির মুগ্ধপ্রাণের ভাবতন্ময় রূপটি। এই দুইয়ের মধ্যে একটা শূন্যস্থান থেকে যায় --- যা পূরণ করতে পারে পূর্বোল্লিখিত রূপান্তরের ব্যাখ্যা। এই অন্তর্বর্তী অধ্যায়টি অলক্ষ্যে থেকে যায়। এছাড়া প্রেমের উন্মেষের পরিণতি উক্ত দুটি ছোটগল্পে দুরকম--- "সমাপ্তি"তে মিলনান্তক, "মাল্যদান"এ বিয়োগান্ত। কিন্তু এই গানে কোন পরিণতির ইঙ্গিত নেই, গানের সমাপ্তি ঘটে প্রাণে সঞ্চারিত আশায়। সেই আশা চরিতার্থ হবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর এই গানে মেলে না।

উল্লেখপঞ্জী

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৪২১
২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গল্পগুচ্ছ, কলিকাতা,বিশ্বভারতী, ১৯৬৮, পৃ ১৯৮
৩) তদেব, পৃ ৫০৭
৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৩৮১
৫) তদেব, পৃ ৩৪৮
৬) তদেব, পৃ ২৯৩
৭) তদেব, পৃ ৫৮১
৮) তদেব, পৃ ৭৪৬
৯) তদেব, পৃ ৮৮
১০) তদেব, পৃ ১০১
১১) তদেব, পৃ ৪৮
১২) তদেব, পৃ ৩১
১৩) তদেব, পৃ ১১০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

খাতুন, সনজীদা : রবীন্দ্রসঙ্গীত মননে লালনে, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১
চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা: কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩
দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী, কলিকাতা, গ্রন্থনিলয়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী,১৯৮০